৮

ভেতো বাঙ্গাল বংশের মতন সত্যিকারের খানে-ওয়ালা আমরা কেউই নই। তবে খানে–ওয়ালা না হলেও, আমি ও আমার কন্যাদ্বয় কেন জানিনা, রোববারগুলিতে প্রয়োজনের চেয়ে একটু যেন বেশীমাত্রায়ে পেটুক হয়ে পড়ি। আমাদের মেয়েদুটি, যারা কিনা সোম থেকে শনির সারা সপ্তাহে ক্ষুদ্রায়তন কিছু বাটিতে কর্নফ্লেক্স-দুধ, অল্প ফলমূল বা সামান্য ভাতরুটি ও চিকেনের পাতলা সুরুয়া খেয়েই হৃষ্ট ও অপরাপর সন্তুষ্ট থাকে, রোববার'টি এলেই কেমন দেখেছি, বাপের গুষ্টির মতনই অতিমাত্রায় ভোজনবিলাসী হয়ে ওঠে। ছোটটিকে তো তার কাকার ধাতই পেয়েছে বলে মনে হয়। প্রায় প্রতি রোববারেই আমার ছোটকন্যাটি হয়ে পড়ে তার কাকার মতন একেবারে উদরসর্বস্ব ও অতিভোজী। অন্যদিকে বড়ো'টি এখন আগের চেয়ে অধিকতর পরিপক্ব হলেও, রোববারের দুপুরের খাওয়াটির ব্যাপারে কিন্তু সপ্তাহের অন্যান্য দিনের চেয়ে কিন্তু বেশী আগ্রহী। ইদানীংকালে দেখেছি বড়োটি সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলিতে খায় যতসামান্যই। (হয়তো বা কোনো অলীক খোয়াবে 'দীপিকা পাড়ুকোন' বা অন্য কোনও হলিউড / বলিউডী নায়িকার সাথে নিজের কিছু আদল বা ঔপম্য খুঁজে পেয়েছে সে)। কিন্তু রোববার এলেই, তার ভোল যাবে পাল্টে। এবং শুধু তাই নয়, যেটুকু খাবার সে খাচ্ছে, পুরোটাই যেন বাপের মতন। এমনকি খাবার খাওয়ার ভঙ্গিমাটিও যেন একদম তার বাপেরই অনুরূপ। আমার মা তাঁর বড় দৌহিত্রী'টির খাওয়ার ভঙ্গিমাটি লক্ষ্য করেন আর মাঝে মাঝে মুচকি হেসে আমার স্ত্রী'টির উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেন, "আরে বাবা, বললে হবে? 'জীন' কথা বলে..."। আর এ হেন 'জীন', 'হেরেডিটি' বা পরম্পরার সংক্রান্ত নানারকমের অতিচমৎকার কাহিনী নিয়ে আমাদের বাড়ীতে বেশ জমে ওঠে রবিবাসরীয় খাওয়ার টেবিল। শুধু খাওয়া প্রসঙ্গেই, একদিকে মেয়েদের ও আমার ও অন্যদিকে আমার সাথে আমার ছোটভাই ও বাপজ্যাঠাদের 'জীন'জনিত মিল-গরমিলের হিসেব নিকেশের গল্প তো বটেই, তার সাথে মাঝে মাঝে আবার যুক্ত হয়ে ওঠে, আমার শ্যালকের ও তাঁর মাতুলদের সাথে তাঁর তুলনার গল্প। তবে এসমস্ত আবেগপ্রবণ ও স্পর্শকাতর রবিবাসরীয় আড্ডায়ে, আমার বড় কন্যা যে খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে তার মায়ের ধারাটি না পেয়ে, তার বাপের মত 'বাঙ্গাল' ধারাটি পেয়েছে, সে নিয়ে তো আমার স্ত্রী'টিকে তো খুব একটা মনখারাপ করতে দেখিনি। বরং তিনি নিজেই একেবারে তাঁর বাপের আদলেই গঠিত বলে, ব্যাপারটি নিয়ে বেশ খুশিই থাকতে দেখি।

তবে কন্যাদুটির বয়েস এখনও কম। ঠাকুরমা বা মায়ের কথা কিছুই প্রায় বোঝেনা তারা। 'জীন', 'হেরেডিটি' বা পরম্পরা বিষয়ে কিছু ওদের কিছু কৌতূহলী জিজ্ঞাসা থাকলেই, ওদের ঠাকুরমাও সঙ্গে সঙ্গে ওদের মা'ও শুরু করে দেবেন নানান ধরণের পুরনো গল্প। ঠাকুরমার কাহিনীতে ঘুরেফিরেই আসবে ওদের বাপ ঠাকুরদার ছেলেবেলার গল্প, ঢাকুরিয়ার গল্প ইত্যাদি। তারই সঙ্গে ওদের মা'ও খুলে বসবেন তাঁর মেয়েবেলার কাহিনী। আর তারই সাথে, শৈশবের সে সব অর্থহীন গল্প ছাড়াও, আমি আবার সামান্য উদ্যোগী হয়ে ওদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, 'জীন' কথাটির বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ও তত্ত্ব। প্রোটিন, ক্রোমোজোম দিয়ে কিভাবে বংশ পরম্পরায়ে ছড়িয়ে পড়ে 'ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের' মলিকিউল তা নিয়ে আমার কিছুই জ্ঞান না থাকলেও, কৌতূহল কিন্তু আছে অপরিসীম। তবে, রোববারদিনটি'তে খেতে বসে, আমার বড় কন্যাটির খাওয়ার অভ্যাস পর্যবেক্ষণ করে, তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ও বংশপরম্পরাক্রমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদির পুনরাবৃত্তি নিয়ে আমি কিন্তু একটু হলেও গর্ববোধই করি।

মেয়েদুটি'কে ছেড়ে, সংসারের বাকি মহিলা বলতে তো রইলেন আমার মা ও জীবনসঙ্গীনী'টি। তা খাওয়ার দিক থেকে বিচার করতে গেলে, আমার পরিবারের ওই ভদ্রমহিলা দুজন রোববারের দুপুরে মোটামুটি পর্যাপ্ত পরিমানে খেলেও, তাঁদের দুজনকেই কিন্তু মাত্রাবদ্ধই থাকতে দেখেছি চিরকাল। স্ত্রী'টি তো শুধু মাত্রাবদ্ধই নন, তাঁদের পরিবারের মতন যথেষ্ট 'জীনবদ্ধ'ও থাকেন। রোববারের খাওয়ার বিষয়ে ব্যাতিক্রম ছিলাম

কেবলমাত্র 'আমি'। সে একেবারে প্রান হাতে করে গ্রাম্য চাষাভুষোর মতন 'পেটচুক্তি' খাওয়া যাকে বলে। অত্যধিক পরিমানে, অন্যান্য দিনের তুলনায় চতুর্গুণ ভাত সাবড়ে নিয়ে, হাঁসফাঁস করতে করতে বেলা আড়াইটে-তিনটে নাগাদ দিবানিদ্রা যাওয়া ছাড়া আর কোনও গতিই থাকত না আমার। এইতো কিছুকাল আগে অবধিও, রোববারের দুপুরবেলা আকণ্ঠ খেয়ে উঠে একটি ছোট হজিমগুলিও বা সামান্য মৌরিভাজা খাবারও জায়গা থাকতোনা আমার পেটে। এখানেও বোধহয় জীনই কথা বলে। মায়ের কাছে তো শুনেছি, একান্নবর্তী পরিবারে থাকার সময়ের গল্প। রোববারের সকালগুলিতে জ্যাঠামশাই বাজার করে এনে দেওয়ার পর, আমার বাবা একরকমের গ্যাঁট হয়েই নাকি গিয়ে বসতেন আমার ঠাকুমার সামনে। হয়তো একটু রঙ চড়িয়েই বলা, তবু মা'র মুখেই শুনেছি, রোববারের সকালে আমার বাবা নাকি ঠাকুমা'র তরকারি কাটা নিরীক্ষণ করেই জিভের জল সামলাতে পারতেন না।

তবে আমার এই খাওয়াপাগল বাঙ্গাল জীন কিন্তু এখন একটু হলেও স্তিমিত। বয়েস মাত্র পঁয়ত্রিশের কোঠা ছাড়াতেই, গত পাঁচ বছরে, রোববারের দুপুরগুলিতে মাত্র একদুই হাতা ভাত বেশী চেয়ে নিলেই আমাকে শুনতে হত স্ত্রীয়ের অধিক্ষেপমার্কা কড়কানি বা মায়ের আচমকা ধমক। তবে সেসব বেকার তর্জন গর্জনে আমার মতন 'জীন'ইয়াস বেঁটে, বাঙ্গাল ও বদ্যি ভোজনরসিককে দমিয়ে রাখতে পারেননি ওই মহিলা দুজন। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন পন্থায়ে রোববারের দুপুরবেলাগুলিতে আমি হাতিয়ে নিতাম বেশ কয়েক হাতা বেশী ভাত। কখনও নিয়ে নিয়েছি চুপিসারে, মা ও বউ যখন রোববারের খাবার টেবিলে গোল হয়ে বসে কপোল-কল্পিত কোনও আলাপচারিতায়ে ব্যস্ত। কখনও নুন বেশী মাখা হয়েছে বলে ঝটিতি একহাতা নিয়ে নিলাম তো আবার কখনও বা ঝাল বেশীর নালিশ জানিয়ে অজ্ঞাতসারে বাগিয়ে নিলাম আরো একহাতা। কখনও মায়ের রান্নার ভুয়সী প্রশংসা করে মন ভুলিয়ে দিলাম, আবার কখনও বা বউয়ের সাথে অকারণ তামাশা করে আত্মসাৎ করলাম কিঞ্চিৎ ভাত। কখনও আবার একেবারে আড়ালে আবডালে বেআইনিভাবে ভাত অপহরন করতে গিয়ে, ওঁদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলে, একটু রাগান্বিত মুখচোখ করে দাঁত খিঁচিয়েই দিলাম না হয় দুইএকবার। আমার প্রধান উদ্দেশ্যটি আর কিছুই নয়, রোববারের খাবার পাতে, অন্যান্য দিনের নিরিখে, ভাতটি যেন একটু বেশী পাই। রোববারের দুপুরের ভাতের পরিমাণ বর্ধন করতে গিয়ে কতরকম যে ছলাকলা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমরকৌশল আমাকে অতীতে উদ্ভাবন করতে হয়েছে, তা মনে মনে ভেবে হেসেই ফেলি মাঝে মধ্যে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রতি রোববারে এমন ভাতচুরির জাদু গত চল্লিশটি বছর ধরে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে এলেও, এই বছর পাঁচেক হল রবিবাসরীয় খোরাকটি বেশ হ্রাসই পেয়েছে আমার। চল্লিশ পেরিয়েই মধ্যবয়েসের বিভিন্ন জীবনধারা জনিত রোগ দেখা দেওয়ার পর থেকেই, একা শুধু ভাত নয়, ছাঁটাই করতে হয়েছে এক এক করে অনেক কিছুই। এমনকি, রোববারের খাওয়াদাওয়াতেও ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারিতে আমার সাধের নেয়াপাতি ভুঁড়িটিও এখন বেশ ইঞ্চিতিনেক সঙ্কুচিত বলেই মনে হয়।

তবে জীবনের প্রথম পঁয়ত্রিশ চল্লিশটি বছরের প্রায় হাজার দুয়েক রোববারের দুপুরগুলিতে একটু অতিরিক্ত ভাত না খেয়ে, উপায়ই বা কি ছিল? শুধুই কি জীন, নাকি ছিল আরও অন্য কিছু যুক্তি? ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি শুধু খাবার নয়, রন্ধনসম্পর্কীয় যেকোনো বিষয়েই আমাদের এই বাঙ্গাল বাড়ীটির যেন অনাবশ্যক এক উদ্দীপনা। ঘটনাগুলি একটু গ্রাম্য ও বিষয়টি আজকের আধুনিক দিনের তুলনায় বেশ স্থূল ও কেমন যেন সূক্ষ্মতাবর্জিতও বটে। (ভেবেই ত্রস্ত লাগছে – সকলের আবার এই লেখা পড়লেই খুব মোটা দাগের ও অপরিশীলিত মনে হতে পারে)। তবে যে যাই বলুননা কেন, আমার কিন্তু খাসা লাগত সেসমস্ত খাদ্যসর্বস্ব শৈশবের রোববারগুলি। আর এখন সে সব ভাবতে বসলেই বেশ আশ্চর্যান্বিত লাগে।

সব রোববার তো আর মাংস-কালিয়া বা ইলিশ-চিংড়ি খাওয়া হয়না। রোববারের ছুটির দিনের দুপুরে, মা বাবার সাথে আমাদের ঢাকুরিয়া'র বাড়ীতে, কত মুখরোচক যে মায়ের রান্নাকরা, কতরকমের ছ্যাঁচড়া, ছেঁচকি, চচ্চড়ি, ডালনা, দম, ঘন্ট, ঝোল, তর কারি ও নানান অত্যাশ্চার্য ভাজা খেয়েছি, তা এখন ভাবলেই কেমন বিস্মিত লাগে। সে হল গিয়ে সত্তরের দশক বা আশির দশকের প্রথম দিকের কাহিনী। সে সময়ে এমনও কয়েকটি রোববারের দুপুর আমরা অতিবাহিত করেছি, যেখানে মাছমাংস ধরা-ছোঁয়ার বাইরে হলেও, কেবলমাত্র তুচ্ছ কচুবাটা, কাসুন্দি বা দু দিনের বাসিডাল শুকনো দিয়ে অল্পপরিমাণ আমের আচারের সর্ষের তেল দিয়ে অতিশয় তৃপ্তি করে খেয়েছি উঠেছি আমরা। সঙ্গে অবশ্য থাকতেই হবে কোনধরণের মুচমুচে কিছু ভাজা। তা সে হালকা গোলাপি রঙের মুসুরির ডালের বড়ি ভাজাও হতে পারে অথবা আধ-ফোটা সেদ্ধ ডালের পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভাজা বড়া। তার সাথে সামান্য শসা কুচি ও পেঁয়াজকুচি দিয়ে বাঙালী স্যালাড।

পুরোটাই বুঝি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের খেলা। ওই সময়ে বাবার দেখাদেখি কিছু না হলেও দশ থেকে পনেরো প্রকারের শাকের (শাগ নয়) হরেক রকমের ভাজা ও ঢাকাই ঘরানার প্রচুর তরকারিও খেয়েছি আমি। এর মধ্যে চলতি ঘরানার কাটোয়ার ডাটার তরকারি, পুঁই শাকের চচ্চড়ি বা পালং শাকের ঘন্ট তো আছেই। তদুপরি আছে,আমাদের বাড়ীর বিশুদ্ধ ঢাকাই কৌশলে রান্না করা কুমড়োর শাক, লাউ শাক, আস্ত আস্ত গোটা ছোলার ডাল দিয়ে বা ইলিশ মাছের মুড়ো দিয়ে রান্না কচুর শাক। এ ছাড়াও ছিল মুলো শাক, মেথি শাক, ব্রাহ্মী শাক, লাল শাক, কলমি শাক, বেতো শাক ইত্যাদি। অনেক রোববারে কেবলমাত্র এইসমস্ত শাক দিয়েই বাবার মতন প্রচুর পরিমানে ভাত সাঁটিয়ে বিস্মৃতই হয়ে গিয়েছি যে আজ রুই কাতলা ইলিশ ভেটকি বা কচি পাঁঠার মাংস খাওয়াই হলনা। শাকের কথায়ে মনে পড়ে গেল, ফুলকপির ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট পাতা ও ডাটাগুলি দিয়ে সামান্য সর্ষে বাটা বা পাঁচফোড়ন দিয়ে অত্যন্ত মুখোরচক ও রুচিকর একটি শীতকালীন পদ আমাদের বাড়ীতে মা বানাতেন বেশ ঘনঘনই। তদ্ব্যতীত, কতপ্রকারের যে তরিতরকারির যে খোসাভাজা বা আরও রকমারি ব্যাতিক্রমী ভাজা যে আমি ছেলেবেলায়ে চেখে দেখেছি তার কোনও ইয়ত্তা নেই। পোস্ত ছড়িয়ে আলুর খোসা বা পটলের খোসাভাজা বা শুকনো লঙ্কা ছিঁড়ে লাউ'এর খোসাভাজা, নানাবিধ বড়িভাজা, বেসনে ডুবিয়ে কমলা রঙের কুমড়োফুল বা সাদা রঙের বকফুল ভাজা, শিউলিপাতা বা পাটপাতা বেসনে ডুবিয়ে ভাজা, এইসব তো লেগেই থাকত রোববার রোববার। কয়েকটি রোববারে যেমন হত আমার বাবার একান্ত পছন্দের গোটা পোস্ত (নিয়মমাফিক পোস্ত বেটে নয়) ও সামান্য আটা কিমবা ময়দা গুলিয়ে, একটু লেই মতন করে, ডিমের অমলেটের মত একটি কড়কড়ে ভাজা। যেটিকে কিনা আমার বাবা বলতেন পোস্ত'র চাপটা বড়া। সে চাপটা বড়ার যে স্বর্গীয় স্বাদ, তা সে যে না খেয়েছে, সে উপলব্ধি করতে পারবেনা। সাধারণ বাঙালি রসনার আলু ভাজা, খোসাসমেত পটল ভাজা, সামান্য রসুন ফোঁড়ন দিয়ে ঢ্যাঁড়স ভাজা, বেসনে ডোবানো ফুলকপি ভাজা, মাছ বা ডিমভাজা অথবা পেঁয়াজি বা বেগুনি'র গোত্রে না পরলেও, আমার মায়ের হাতের বানানো এইসব নিম্নমানসম্পন্ন ভাজভুজি জমিয়ে দিয়ে গেছে আমার শৈশবের এক একটি রোববার।

কেবলমাত্র বাঙালী কেন, সব জাতের ছেলেপুলেরাই, বোধকরি মায়ের হাতের রান্না অমৃতসমান জ্ঞান করেন। আর আমিও তার ব্যাতিক্রম নই একেবারেই। তবে সবদিক বিচার করে, একেবারে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়েই বলতে পারি, আমার মা, সে সময়ের অন্য কোনও সমকক্ষ মায়েদের তুলনায়, পেঁয়াজ রসুনধর্মী ও নিরামিষ রান্না (সেকেলে ধরণের সকল বাঙ্গালী রান্নাই) একটু বুঝি বেশীই ভাল করতেন ও এখনও করেন। আমার মায়ের হাতের রবিবাসরীয় বৈশিষ্ট্য বলতে ছিল, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল (পেঁয়াজ থাকবে তাতে), মাংসের কিমা বা কুচো চিংড়ির পুর দিয়ে পটলের দোরমা (অনেকে দোলমাও বলেন), দই ও আদা পেঁয়াজ রসুনের এক

অদ্ভুত প্রয়োগকৌশলে রান্না করা পাকা রুই বা কাতলা মাছ, অনেকটা আদাকুচি, রসুন ও ধনেপাতা সহযোগে মিহি করে রান্না করা সস্তার লইট্যা মাছের ঝুরি এবং পেঁয়াজকলি দিয়ে ছোটছোট ট্যাংরা মাছের ঝাল। এছাড়াও রোরবারের পাতে থাকতেই হবে সাধারণ বাঙালী বাড়ীর মুড়িঘন্ট, কাঁকড়ার ঝোল বা উদগ্র ঝালতেল সহযোগে কাঁঠালের বীচি ও আলুকুমড়ো দিয়ে শুঁটকি মাছের মাখো মাখো তরকারি। শুধু তাই নয়, এইসকল রান্নায়ে আমার মা তেল ঢালতেন অকৃপণ হাতে। এখন তো এই ডায়াবিটিস ও কোলোস্টেরলের জামানায়ে এইসব শুনলেই কেমন যেন বিপজ্জনক ও স্বাস্থ্যহানিকর লাগে। কিন্তু ওইসব তৈলাক্ত খাবার দিয়ে কুইন্টাল খানেক ভাত সাবড়ে দিয়েছি আমি অনেক রোববার।

পেঁয়াজরসুনের প্রয়োগ বা অপরিমিত তেল ছাড়াও, সাধারণ নিরামিষ রান্নাও অসাধারণ করে বানাতেন আমার মা। রোববারের দুপুরে আমার মায়ের অভ্যস্ত হাতে করা বাঙ্গাল বাড়ীর লাউঘন্ট (সে চিংড়ি মাছ দিয়েই হোক বা ছাড়া), মোচাঘন্ট, (আমার ছোটভাইটির প্রিয়) কুমড়ো সহযোগে থোড়ঘন্ট, মুলোঘন্ট, কচুর শাক ও কচুর লতি, রসুন ও কালোজিরে দিয়ে গাঁঠিকচুর তরকারি, মাদ্রাজি ওল বা মানকচু বা সামান্য নারকোল কোরা দিয়ে রান্না করা অসামান্য শোলাকচু খেয়ে ভূয়সী প্রশংসা করতে শুনেছি ঢাকুরিয়া পাড়ার অনেক আচ্ছাআচ্ছা রাঁধুনি কে। এছাড়াও মনে পরছে, মা যদি কোনো কোন রোববারে মাছের মুড়ো দিয়ে বাঁধাকপির তরকারিটি বানালেন বা স্রেফ আলু কুমড়ো দিয়ে পালং শাকের অনাড়ম্বর একটি ঘন্ট, অথবা বানিয়ে দিলেন শীতের ফুলকপির একটি গা-মাখা আলু দিয়ে তরকারি, চাল পটল বা আমার বাবার অতিপ্রিয় বড়িভাজা গুঁড়ো দিয়ে সাদা শিমের শুকনো চচ্চড়ি, কিছু না হলেও কমপক্ষে দুতিন কৌটো চাল বেশি নিতে হতো, আমার আর আমার বাবার জন্যে। তবে আমার জব্বর লাগত (এখনও তেমনই প্রিয় আছে), এঁচোড়ের পেঁয়াজবিহীন জিরে বাটা দিয়ে তরকারি। পেঁয়াজরসুন বিহীন রান্নার মধ্যে, এরই সাথেই যোগ করতেই হবে কাঁচাকুমড়ো ও বেগুন সহযোগে ইলিশ মাছের পাতলা ঝোল, জিরে বাটা দিয়ে রুইমাছ বা চারাপোনার ঝোল ও আমার বিশেষ প্রিয় চিংড়িমাছ দিয়ে আলুপটলের ডালনা। এছাড়াও আমার বাবার রবিবাসরীয় পছন্দের মধ্যে খুব সহজেই প্রথম সারিতে রাখব, মায়ের হাতের তৈরি, কুমড়ো ও পেঁয়াজকুচি দিয়ে হালকা সর্ষেবাটার বোয়াল মাছ বা শোল-মুলো। মায়ের নিজের পছন্দ অবশ্য ছিল বড়বড় পাবদা মাছের বড়ি ধনেপাতা ও কালোজিরে দিয়ে ঝোল ও একইরকম ভাবে করা ছোট পারশে অথবা পম্ফ্রেট বা গুরজালি মাছের ঝোল। এছাড়াও অসংখ্য রোববার, মায়ের হাতের বানানো চিতল মাছের মুইঠা, তেল-কই বা ফুলকপি দিয়ে কইমাছের ঝোল খেয়ে ভুলিনি এখনও।

বস্তুত, রোববারের খাবার বিষয়ে আমাদের ভাগ্যটিই বেশ সুপ্রসন্ন ছিল বছর পাঁচেক আগেও। এই যেমন আমার অবাঙ্গাল স্ত্রী'টিও। তা তিনি তাঁর বাঙ্গাল মায়ের ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের প্রভাবে বা অতিবাঙ্গাল স্বামীটির মন রাখার জন্যই কিনা জানিনা, রবিবাসরীয় রান্নার বিষয়ে ছিলেন কিন্তু বড়ই চৌকস। কয়েকটি রোববারে আমার রন্ধনপটীয়সী বউটির হাতের প্রচলিত কিছু রান্না তো প্রকৃতরূপেই সুস্বাদু হত। তবে সে রান্নার ধাঁচ মায়ের সাথে সাদৃশ্য নেই একেবারেই। (এই তো যেমন গত একটি দুটি আগের রোববারের দুপুরবেলাতে কচিপাঁঠার লাল রঙের গাঢ় অথচ হালকা ঝোল খেয়ে আমরা গোটা পরিবার মিলে প্রায় ধেইধেই করে নাচতেই বাকি রেখেছিলাম। মাংস ও প্রায় কেজিদুয়েক ভাত তো নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যেতেই, শেষ অবধি ঝোল চেটেচেটেই আমাদের ছোটটি তো থালাটিকে এমন ধোপদুরস্ত করে ছেড়েছিল, যে শেষমেষ তো তাকে বেশ একটি কড়াধমক দিয়েই বিরত করতে হয়েছিল)। বউটি আমার প্রচলিত ও প্রথাগত বাঙালী রান্নায়ে তো আছেনই, উপরন্তু চীনে খাবার ও বিশেষত মোগলাই ঘরানার রান্নায়ে তো নিজেকে খুবই তয়াকিবহাল ও পটু করে তুলেছিলেন গত একদশকে। মাংসের যেকোনো রান্নায়ে, (তা সে সাধারণ বাঙালীর ঝালঝোলই হোক, বা কষা, বা হোক উত্তর ভারতীয় রেজালা, কাশ্মীরি রোগানজোস কিম্বা পাঞ্জাবী ভর্তা) আমার বউটি কিন্তু

এখন যেকোনো মাঝারি ধরণের শেফকেও সামান্য হলেও অপ্রস্তুত করে দিতে পারতেন। এছাড়া 'ভারতীয়-ঘরানার' ইন্দ - চীনে খাবারও বেশ পারদর্শিতার সাথে উপাদেয় করে বানাতে শিখে নিয়েছিলেন উনি। এই যেমন রোববারের সন্ধ্যে বেলায়ে শুকনো মসলাযুক্ত 'ভারতীয়' চিলিচিকেন, তীব্র মেজাজী সসে অস্থিহীন মুরগির চিকেন মাঞ্চুরিয়ান, গন্ধহীন বাসা মাছের হালকা গ্রেভিওয়ালা লেবুপাতা সহযোগে সুগন্ধি উদ্ভাবনী রান্না বা রোববারের সকালের রসুন ও সবুজ চিলিসস দিয়ে পাড়ার রোলের দোকানের চাওমিন, সবেতেই ভালো হাত পাকিয়েছিলেন উনি। তবে আমার স্ত্রী রান্না করতেন একটু উপকরনধর্মী। সঠিক সময়ে সঠিক উপকরনটি না থাকলে, আমার বউটি সে রান্নায়ে তাঁর কুশলী হাতই লাগাতেন না। রোববারের মোগলাই রান্নার জন্যে আসত নবী মুম্বইয়ের একটি বিশেষ দোকানের থেকে জয়িত্রী, জায়ফল, ঘি, শাহিজরা, কাবাবচিনি, আমচুড়, জাফরান, কসুরি মেথি, চারমগজ বা কাজু বাদামের পেস্ট। চীনে খাবারের জন্যে আবার আমাকে ছুটতে হত অন্য আরেকটি দোকানে। সেখান থেকে তো আনতে হবে সাদা তিল ও চীন দেশের খাঁটি তিলের তেল। এছাড়াও মাঝে মধ্যে নিজেই কিনে নিয়ে আসতেন ব্যাম্বু শুটস, টোফু, বিন-স্প্রাউটস, ব্ল্যাক বিন বা অয়েস্টার সস, বিভিন্ন প্রকারের চীনে ভিনিগার, বক চোই বা সিচুয়ান মরিচ।

তবে এতকিছু বলা সত্ত্বেও এটা কিন্তু মানতেই হবে যে চলতি ধরণের বাঙ্গাল রান্নায়ে বা আদর্শস্বরূপ অবাঙ্গাল রান্নায়ে আমার শাশুড়ি মায়ের রান্নার হাত'টি কিন্তু এককথায়ে অতুলনীয়। আমাদের অনেক দিনের অভিযোগ ছিল যে, আমার মায়ের হাতে কোনদিনই আমরা উৎকৃষ্ট পোলাউ খেতে পাইনি। মাঝে মাঝে কয়েকটি রোববার গাওয়া ঘি'য়ে বানানো আদা কুচি দেওয়া বাঙালী ফ্রায়েড রাইস খেলেও, প্রায় জানতামই না ভালো অবাঙ্গাল পোলাউ জিনিসটি খেতে কেমন হয়। আমাদের বিয়ের পরের বেশ কিছু রোববার খেতে পেয়েছি আমার শাশুড়ি মায়ের হাতের তৈরি জাফরান রঙের আভাস দেওয়া খাঁটি পোলাউ। প্রতিটি গ্রাসে যথেচ্ছ কাজু কিশমিশের সাথে বাসমতী চালের সে যে কি ঐশ্বরিক সুঘ্রাণ, সে কেবলমাত্র ওঁর হাতের বিশেষ পোলাউ খেলেই বুঝতে পারা যাবে। এছাড়া কলকাতার কিছু বিশেষ বিশেষ অবাঙ্গাল আহার্য তো ওঁর হাতে খেয়ে ভোলা যাবেনা কোনদিনই। ছোলার ডাল বাটা দিয়ে মাংসের কিমার সামি কাবাব, প্রকৃষ্ট ঝাল দেয়া খাসির কষা মাংস, উত্তর কলকাতার তেলেভাজা, বিজলীগ্রিলের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর ফিশ ফিঙ্গার, ফ্রাই বা অরলি, বিভিন্ন প্রকারের চপ, চিংড়ির বা মুরগির কাটলেট, অবিকল দোকানের মতন ত্রিকোন ফুলকপির শিঙ্গাড়া, এগচিকেন রোল, চিকেন চাওমিন, অনবদ্য কেক, ধ্রুপদী পুডিং, কেতাবি ধাঁচের ছানার মিষ্টি, মালপোয়া, কালোজাম বা পান্তুয়া এইসমস্ত কেবলমাত্র ওঁর হাতেই খেয়েছি গত দেড় দশক ধরে। তাছাড়া বেশ কিছু রোববারে ওঁরই হাতে খেয়েছি আলু আর বেগুন দিয়ে করা মাছের তেলচচ্চড়ি, পুঁই-চিংড়ি, ভেটকির পাতুরি বা ওই মাছেরই কাঁটার শুকনো চচ্চড়ি বা ইলিশমাছের সর্ষে ভাপা। শাশুড়ি মায়ের হাতের রান্নার। সে সব রোববার তো আমার কাছে এক দৈবযোগ বই আর কিছু ছিলনা।

তবে এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এখন তো রোববার সমেত সারা সপ্তাহ জুড়েই কেবল কিছু ফলমূল, ছোট ছোট বাটিতে ওটস, দুই কি তিন চামচ গাঢ় খয়েরি রঙের ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত, মাছ বা চিকেন সিদ্ধ আর মাঝে মধ্যে ডিমের সাদা অংশটি। এই ভাবেই চলছে বেশ কয়েক বছর হল। এই কিছুদিন আগেই তো বলেছি, রোববারের সকালের বাঙালী জীবনের প্রতিকস্বরূপ প্রাতরাশে লুচি ও খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় আলুর কালোজিরে দিয়ে সাদা তরকারিও গত দুতিন বছরে বাড়ীতে একবারের জন্যেও খেতে পেয়েছি বলে মনে পরছেনা। তবে এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ, বাঙ্গাল অথবা অবাঙ্গাল, এইসমস্ত তর্কসাপেক্ষ এবং অতিবিবাদিত বিষয় নিয়ে আমার শৈশব সুলভ কিছু মানসিক আবেগ থাকলেও, বোধশক্তিটি কিন্তু বেশ কম। তবে কোনদিন লুচিটুচি খেলে, আলুর সঙ্গে কালোজিরে দিয়ে হলুদবিহীন

সাদারঙের তরকারি হলেই আমার খুব চলবে। আর খেতে সাংঘাতিক কিছু সুস্বাদু না হলেও, হতে হবে অল্পবিস্তর একটু বাঙালী ঘরানার ও তৃপ্তিকর। তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, এমন কিছু বিশেষ পূর্ববঙ্গীয় আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে আমি খেয়ে দেখেছি, যেখানে কিনা লুচি আর পরোটার তফাৎ ধরাই যায়না। তরকারি বানাতে গিয়ে সেসব বাঙ্গাল রাঁধুনি কালোজিরে ফোঁড়ন দিয়ে, তাতে আলু না মিশিয়ে বরং আলু ফোঁড়ন দিয়ে তাতেই কালোজিরে মেশান বলে আমার বদ্ধমুল ধারণা। আবার এমনও কিছু বাড়ীতে এই অতিমামুলি তরকারিটি খেয়ে দেখেছি, যেখানে আলুর তরকারি কোনমতে রান্না করে কড়াই থেকে নামিয়ে নেওয়ার পরেই, শিক্ষানবিশ রাঁধুনিটি সে তরকারির উপরে খামোখা ছড়িয়ে দিয়েছেন বেশ কিছু কাঁচা কালোজিরের দানা, অনাহূত পেঁয়াজকুচি ও অযাচিত কিছু ধনেপাতা। ওই আজকাল যেরকম টেলিভিসনের সমস্ত রান্নায়ে তালিম দেওয়া অনুষ্ঠানে, শেষে কিছু একটু রংবেরঙের অলঙ্কার দিয়ে ভূষিত করা হয়, কতকটা যেন সেরকম। আর সত্যি কথা বলতে কি, খাঁটি বাঙালী বাড়ীতে রান্না করা সে কাঁচা কালোজিরে দিয়ে শোভিত আলুর তরকারি কিন্তু আমার মত বিশ্বপেটুকেরও খেতে নিতান্ত অরুচিকরই লেগেছে। পক্ষান্তরে, এমন কিছু অবাঙ্গাল বাড়ীতে আমি খেয়েছি, যাদের তৈরি করা চিংড়ির মালাইকারি, ইলিশ মাছের ভাপা, মৌরলা মাছের টক, কুমড়োর ছক্কা, ধোঁকার ডালনা বা পাটিসাপটা খেয়ে আমি ভুলতে পারিনা আজও।

তবে কথায়ে বলে ‘আপ রুচি খানা’। যার যে খাবারটি যেভাবে পছন্দ, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের প্রভাবে শৈশব থেকে ঠিক যেমনটি ভাবে খেয়ে এসেছেন, সে তো সেভাবেই খাবেন। আমার মুম্বইয়ের কিছু সহকর্মীকে বছরখানেক আগে কলকাতায়ে নিয়ে গিয়ে ‘৬ বালিগঞ্জ প্লেস’ নামক খ্যাতনামা রেস্তরাঁয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। রেস্তরাঁয়ে যাওয়ার পথে, বাঙালী খাবারের গুণকীর্তন করে ও বাঙালী খাবার নিয়ে আমার সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান তাঁদের কাছে উজার করে দিয়েছিলাম বলেই মনে পড়ছে। লম্বালম্বা করে কাটা বেগুণভাজা, পোস্ত নারকেলের বড়া, মোচার চপ ও মুগের ডাল দিয়ে শুরু করিয়েছিলাম ওই গুজরাটি ও মারোয়াড়ী সহকর্মীদের। তারপরে একে একে আনিয়েছিলাম দই-পটল, ছানার ডালনা ইত্যাদি। অনেক বাঙালীরই বিশ্বাস করতে অসুবিধা হবে, কিন্তু সত্যবাদিতা করে বলতেই হচ্ছে যে আমার ওই গুজরাটি ও মারোয়াড়ী সহকর্মীদের ছানার ডালনা ছাড়া আর কিছুই তেমন ভালো লাগেনি। খেতেও পারেননি সেদিন ওঁরা কেউ ঠিক করে।

মুম্বইয়ের সারা অফিসে তো আমি ঢোল পিটিয়ে বেড়াতাম কলকাতার পার্ক সার্কাসের বিরিয়ানির গল্প শুনিয়ে। মুম্বইয়ের ‘খার’ নামক একটি এলাকায়ে খুলেও গেল আমাদের অতি পরিচিত ‘আরসালান’। মুম্বই অফিসের দুতিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে গিয়ে আরসালানের মাটন বিরিয়ানি ও চিকেন চাপ খাইয়ে ছেড়েছিলাম। ওঁদের সেই বিরিয়ানির স্বাদগন্ধ কিছুই পছন্দ হয়নি বলেই মনে পড়ছে। বিরিয়ানিতে গোটা গোটা লবঙ্গ, গোলমরিচ ও ধনেপুদিনা না পেয়ে ওঁরা বেশ নিরুৎসাহ হয়ে পরেছিলেন বলেই মনে পড়ছে। গল্প প্রসঙ্গে বলি, আমাদের মুম্বইয়ের বাসস্থানের নিকটেই একটি বাঙালী রোলের দোকান হয়েছে এই বছর পাঁচেক হল। ওঁদেরই একটি বাঙালী যুবক দুঃখ করে প্রায়ই বলে, “স্যার আমাদের রোল বিক্কিরি ওই দুর্গা পুজোর চারটে দিন”। সত্যিই কিন্তু তাই। বছরের বাকি দিনগুলি রোলের দোকানের বাঙালী যুবকগুলি কেবলই মাছি তাড়াচ্ছেন। সন্ধ্যেবেলার চটজলদি খানায়ে, মারাঠি বড়া-পাও আর গুজরাটি পাও-ভাজিকে, ওই বাঙালী রোলের দোকান কোনদিন পরাজিত করতে পারবে বলে তো মনে হয়না।

এইসব ভেবেচিন্তেই আমার মনে হয়, রসনার ব্যাপারে সবচেয়ে তাৎপর্যময় কারণগুলি হল শৈশব ও একইসঙ্গে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। এক প্রজন্ম থেকে থেকে অন্য প্রজন্মে, বাপ মায়ের থেকে ছেলে মেয়ের মধ্যে, ডিএনএ’র সূক্ষ্ম গঠনতন্ত্র সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। যুগ যুগ ও জন্ম জন্মান্তর ধরেই চলছে এই বংশপরম্পরাক্রমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদির

পুনরাবৃত্তি। তাই যখন দেখি, আমার বড়োটি মাঝে মাঝেই যখন ঘনঘন রান্নাঘরে গিয়ে, রেফ্রিজারেটর খুলে কিছু একটু হলেও মুখে চালান দিচ্ছে, দেখে আমার হাসি পেলেও, অসংশয় প্রত্যয় জন্মায় কিন্তু ডি এন এ'র তত্ত্বের উপরেই।

বাঙালী বাড়ীর বিশেষ রন্ধন প্রণালীর বিষয়ে আমার কিছু একান্ত ব্যাক্তিগত মতবাদ ও দৃষ্টিকোণ আছে। আর আমার কেন জানিনা মনে হয়, সেগুলি সামান্য সামাজিক, কিছুটা ভৌগলিক ও আদতে ঐতিহাসিক হলেও, মতবাদগুলি বেশ স্বচ্ছ ও নিতান্তই সহজবোধ্য। পূর্ববঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয় সভ্যতার অসাম্য আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে পুরাদস্তুর অর্থশুন্য শোনালেও, এখনও হয়তো ষাটের দশক অবধি যারা জন্মগ্রহন করেছেন, তাঁদের কাছে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। বাঙালীদের খাওয়াদাওয়া বলতে পাঁচ প্রকার। এক নম্বরে বাঙালীর স্বতন্ত্র নিরামিষ খাবার, দুই'এ রয়েছে মাছের ঝোল, মাংসের ঝোলের মতন বাঙালী আমিষ জাতীয় খাবার, তিনে রাখব বিরিয়ানি, রেজালা, চাপ ধরেনের মোগলাই খানা, চারে রয়েছে ইন্দ - চীনে ঘরানার খাবার আর পাঁচে রাখব চীনে ছাড়া অন্য বিদেশী খাবারকে, যেগুলি কিনা পাতি বাংলা ভাষায়ে কন্টিনেন্টাল বলা হয়ে থাকে।

আমিষ বা নিরামিষ প্রসঙ্গে জানাই, রামায়ণ বা মহাভারতের যুগে ভালো রকম আমিষ খাবারের প্রচলন ছিল। এবং এই বিষয়ে নিবন্ধিত প্রামাণিক তথ্যও আমি বিভিন্ন বইয়ে পড়েছি। মাছ খাওয়া চলত কিনা বলতে পারিনা, তবে মাংস যে ভালরকমেরই চলত তাঁর কথা খোদ রামায়ণ মহাভারতে লেখাও রয়েছে। (শুধু রামায়ণে শুধু সুরাপানের ব্যাপারে সামান্য নিষেধাজ্ঞা ছিল বোধহয়)। সিন্ধু সভত্যা'র সময়ে মহেঞ্জোদারো হরপ্পায়ে মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল বলেই ইতিহাস বইয়ে পড়েছি। তবে এখন কিন্তু আমার নিজস্ব বিশ্বাস যে ভারতের উত্তরদিক, পূর্বদিক ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলের জনসাধারন ছাড়া, সারা দেশেই সমাজের একটু উঁচুবর্ণের হিন্দু লোকজনেরা কিন্তু নিরামিষ খাবারই খান। আর এর একনম্বর কারণ হিসাবে আমার কেন জানিনা মনে হয় ভারতীয় খাবারে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব। তবে বৌদ্ধরা কিন্তু অনেকে আমিষও খেয়ে থাকেন। বুদ্ধদেব তাঁর সাধুদের দশ রকমের মাংস থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাতী, ঘোড়া, কুকুর, বন্য বরাহ, বাঘ, সিংহ, সাপ ছাড়া মানুষের মাংস খেতে বুদ্ধ ধর্মে এক্কেবারে মানা। বাকি সবই বুঝি চলবে। তাছাড়া বৌদ্ধভিক্ষুক ভিক্ষা পাত্রে যা পাবেন, সবই খাওয়া চলতে পারে। কিছু মানা না থাকলেও, বৌদ্ধধর্মের অহিংসা বাণীর অনুগামীবৃন্দ কিন্তু নিরামিষাশী। উত্তরভারতের কথা ধরতে গেলে, প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু কাশ্মীর ও হিমাচলের দিকে আমিষ খাওয়া তো চিরকাল ছিলই, বরং বেড়েই গিয়েছিল মুঘল আমল থেকে। পূর্বদিকের খাওয়াদাওয়াতে জৈন ও বৌদ্ধরা অবশ্য খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। বঙ্গদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজারাজড়া তো তেমন কেউ ছিলেন বলে তো মনে পরছেনা। গৌড় দেশের কর্ণসুবর্ণের শাসক শশাঙ্ক ছিলেন সম্পূর্ণরূপে হিন্দু রাজা এবং সর্বাংশে বৌদ্ধ বিরোধী। বানভট্ট লিখে গিয়েছেন যে রাজা শশাঙ্ক নাকি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এতটাই বিদ্বেষী ছিলেন, প্রতি বৌদ্ধভিক্ষুর মাথাপ্রতি একশো স্বর্ণমুদ্রা বন্টন করতেন। তার আগে নন্দবংশ, মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত বা সুঙ্গদের আমলে, বা পালবংশের অনেক রাজা মহারাজাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু কেউই সরাসরি বঙ্গদেশের নৃপতি ছিলেন না। কেউ মগধ, কেউ কনৌজ, কেউ বা আবার উজ্জয়িনী থেকে বসে রাজ্যপাট চালাতেন। অবশ্য সেন বংশের বল্লালসেন, লক্ষনসেনেরা কিন্তু বৌদ্ধ ছিলেননা। তাঁরা যথাযথ হিন্দুই ছিলেন এবং যতদুর জানি, ছিলেন খুবই গোঁড়া। কুলিন প্রথা বা জাতপাত নিয়ে খুব মাথা ঘামিয়েছিলেন সে সময়ে। তাছাড়াও বইয়েই পড়েছি, সুলতান বা মুঘলদের আমলেও, বাংলার সব নবাব সুবেদারেরা ছিলেন মুসলমান ও ঢাকা থেকেই কাজকর্ম নিয়ন্ত্রন অষ্টাদশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে, মুঘলদের পাঠানো নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বঙ্গদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। বাঙালীর আমিষভক্তির ঐতিহাসিক কারণ বলতে এই আমার মতবাদ। তাছাড়া অসংখ্য নদনদী, উপরন্তু তাদের উপনদী ও শাখানদী মিলিয়ে, আর কিছু না হলেও বঙ্গদেশ পেয়েছে অত্যন্ত উর্বর চাষের জমি ও নানাবিধ মিষ্টি জলের মাছ।

এ তো গেল বাঙালীর আমিষ খাওয়ার গল্প। এইসমস্ত বিচার করেও, বাঙালীর নিরামিষ খাওয়ার পিছনে, আমার কেন জানিনা মনে হয়, ধর্মের চেয়েও বেশী দায়ী বাঙালীদের 'সতী' ব্যাপারটি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই সতীদাহ প্রথা ব্রিটিশরা আইন করে বন্ধ করে দেওয়ার পর বাঙালী বোধহয় শিখে নিয়েছিল কিভাবে সরেস নিরামিষ খানাটি তৈরি করতে হয়। বিধবাদের খেতে দেওয়া হতনা অনেক কিছুই। আদা চললেও, পেঁয়াজ রসুন তো বাদই দেওয়া হবে, তার সাথেও বাদ পড়ত মুসুরির ডাল ও আরও অনেক কিছুই। সেই অসাধারণ সে কারণেই মৌলিক কিছু নিরামিষ রান্না বাঙ্গালীকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন অনেক বিধবা ঠাকুরমা দিদিমারা। তবে তার জন্যে একান্নবর্তী পরিবারে থাকা আবশ্যক।

তবে আমার বাবার ব্যাখ্যানুযায়ী, প্রতি একশো দেড়শ মাইল ছেড়ে ছেড়ে নাকি স্থানীয় রান্না ও কথ্য ভাষার পরিবর্তন হয়। এই ব্যাপারে একটি ছোট গল্প না শুনিয়ে পারছিনা। ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল অবধি পেশাদারী কাজে আমাকে বেশ বার তিরিশেক থাইল্যান্ডে যেতে হয়েছিল। থাইল্যান্ডের মুল ধর্ম বৌদ্ধ হলেও, একটি স্থানের নাম দেখেছিলাম 'ওয়ুথায়া', কিছু রাস্তার নাম দেওয়া ছিল ফ্রা রামা ৯, ফ্রা রামা ৭ ইত্যাদি। স্থানীয় মানুষজনের থেকেই শুনেছিলাম, ওয়ুথায়া নামটি এসেছে আমাদের অযোধ্যা থেকে, এবং রামা ও আমাদের রামায়ণের ভগবান শ্রীরাম একেবারেই সমার্থক। ফ্রা কথাটি'র মানে জিজ্ঞাসা করতে জানা গিয়েছিল, ফ্রা অর্থাৎ কিনা মহান মন্ত্রী, অর্থাৎ কিনা বড় মন্ত্রী, অর্থাৎ কিনা বড়। উর্দু ভাষায়ে বড়িয়া, হিন্দি'তে বড়া, বাংলায়ে বড়, বাংলাদেশের পূর্বদিকে (মুলত চট্টগ্রামে) সেই বড়কেই বলা হবে ফর। আর সেইখান থেকেই বুঝি থাই দেশ গিয়ে সেই বাংলার বড় হয়ে গিয়েছে ফ্রা।

আমার এই মূঢ় স্মৃতিকথন লেখায়ে শুরুর দিকে বাঙ্গাল, পূর্ববঙ্গ বা অবাঙ্গাল গোছের কিছু শব্দ ব্যবহার বা উক্তি করলেও, আমার মনে হয় বাঙ্গাল ও অবাঙ্গাল দুটি জাতের রান্নাই অতিশয় উপাদেয়, যদি রাঁধুনিটি যথাযথ রাঁধতে জানেন। তবে আমার মত অতি রুচিবাগীশ লোকের কাছে অবাঙ্গাল রান্নার খুব সূক্ষ্ম কিছু স্বকীয় ব্যাপার ধরা পরে। এই যেমন রান্নায়ে একটু হলেও চিনির ব্যাবহার, ছানার মিষ্টি বানানো, বা পোস্ত'র ব্যবহার। এই ব্যাপারেও আমার একটি অতি অর্থহীন যুক্তি আছে। এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে বঙ্গভঙ্গ'র মতন এক কলঙ্কময় ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস। শুনেছি, ১৯০৫ সালের পূর্বে, অসম, বাংলা, বিহার ও ওড়িশা মিলে ছিল একটিই ব্রিটিশ প্রভিন্স। নাম ছিল প্রভিন্সিয়াল স্টেট অব বেঙ্গল। বঙ্গভঙ্গের ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য হিসেবে কার্জন সাহেব নাকি সুচিত করেছিলেন, এই সুবৃহৎ অঞ্চলটির পূর্বভাগখানি নাকি একেবারেই অবহেলিত। কলকাতা ও পশ্চিমভাগের বসবাস করা জনসাধারন পূর্বদিকের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপে অনেক বেশী অনুশীলিত, কৃতবিদ্য ও সংস্কৃতিবান। আর ছিলও তাই। পূর্বদিকের দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের পাটচাষিরা পাটশিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করলেন পূর্ববঙ্গে আর তাঁর পরেই কারখানাগুলি সবই পশ্চিমে। এর কারণ রয়েছে। এক নম্বর কারণ হচ্ছে কলকাতা বন্দর, কলকাতা শহরের বাণিজ্যিক স্বাচ্ছন্দ্য ও বিহার উত্তরপ্রদেশের মজুর ও কুলীদের সহজলভ্য উপস্থিতি। পূর্বদিকের তুলনায়, কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসিগণ হয়ে উঠেছিলেন অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী। বিলিতি সাহেবদের অনুকরণ করে সকল পশ্চিমবঙ্গীয় বাড়িতেই তখন ঠাকুর, চাকর, নায়েব, গোমস্তা, মালি দারোয়ান প্রভৃতি। আর রান্নার ঠাকুর বলতে তখন ছিলেন মুলত ওড়িয়া সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ মানুষেরা। (অব্রাহ্মণ ওড়িয়া'রা মুলত ভিস্তিঅলার কাজই করতেন)। কলকাতার বাঙ্গালীরা যতই রসগোল্লা বা ছানার মিষ্টি নিয়ে গর্ব করুন না কেন, রসগোল্লা কিন্তু আদতে একটি ওড়িয়া আবিষ্কার। ধনাঢ্য উত্তর কলকাতার বাঙালীবাবুদের প্রথম রসোগল্লা খাওয়ান কিন্তু ওড়িয়া রান্নার বামুনেরাই। যতই নকুরের কড়াপাক বা ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ বিখ্যাত হোকনা কেন, পশ্চাতে রয়ে গিয়েছেন কিন্তু ওড়িয়ারাই।

মোগলাই খানা নবাবদের থেকেই এসেছিল, সে সম্বন্ধে কোনও তর্কবিতর্ক নেই। নবাবী খানার অন্য একটি আওয়াধি প্রভাব এসেছিল ওয়াজিদ আলি শাহের মতন

লখনউয়ের নবাবকুল কলকাতার মেটিয়াবুরুজে এসে বসবাস করাতে। স্বয়ং ওয়াজিদ আলি নাকি সঙ্গে করে একশোরও বেশী বাবুর্চি ও খানসামা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন মেটিয়াবুরুজে। ওয়াজিদ আলির মৃত্যুর পর, সেই সব মোগলাই খানার বিশেষজ্ঞ বাবুর্চিকুল ছড়িয়ে পরে কলকাতার আনাচে-কানাচে। পার্ক সার্কাস, মল্লিকবাজার ও মধ্য কলকাতার বেশ কিছু মোগলাই রেস্তরাঁ এখনও কিন্তু তাঁদের সন্তানসন্ততিরাই চালাচ্ছেন। অন্যদিকে চীনেরা কিন্তু ভারতে আসতে শুরু করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই। আর তখনকার দিনে, সেই চীনেম্যানদের কাজ মুলত ছিলও কলকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে। তারপরেই শুরু তাঁদের রেস্তরাঁর ব্যবসা, দাঁতের ডাক্তারি ও জুতোর কারখানার ব্যাবসা। তবে চীনে খাবার কিন্তু কলকাতার ইতিহাসের একটি অধ্যায় হয়ে গিয়েছে। তবে প্রকৃত চীনে খাবার আমি দেশে বিদেশে বিভিন্ন রেস্তরাঁয়ে খেয়ে দেখেছি। অত্যন্ত মৃদু সেই ক্যান্টনিস হিউনান পদ্ধতিতে তৈরি খাবার। সেই কারণেই আমি আমাদের মোনোসোডিয়াম গ্লুকামেট দেওয়া চীনে রান্না কে ইন্দ – চীনে বলতেই পছন্দ করি বেশী।

দক্ষিণবঙ্গে ব্রিটিশ'রা ছাড়াও কিছু অংশে ছিলেন ওলন্দাজ ও ফরাসিরা। তবে বাঙালীর শৌখিন জলখাবারে ব্রিটিশ রান্নার প্রতিপত্তি কিন্তু ভীষণ বেশী রকমের। সকালের জলখাবারে, উচ্চবিত্তদের তো বটেই, এমনকি মধ্যবিত্ত সংসারেও মাখন সহযোগে পাউরুটি'র টোস্ট, ডিমসেদ্ধ বা ডিমের পোচ-অমলেট তো চাইই চাই। তার সঙ্গে থাকবে আবার মোটা করে ভাজা আলু (বাঙালীরা বলতেন ফিঙ্গার চিপস), বেকন বা সসেজ, টম্যাটো সস ইত্যাদি। বাঙালীর কেক-পুডিং, বা দুধচিনি ছাড়া দার্জিলিং চা, সবই তো বিলিতি নিয়মানুযায়ী। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, আমেরিকানদের প্রাতরাশ আবার কিন্তু অনেকটাই ভিন্ন। ডিম, পাউরুটি মাখনের চেয়ে বেশ প্রাধান্য দেওয়া হয় ফল ও বিভিন্ন প্রকার শস্যদানামুলক সিরিয়াল ধর্মী খাওয়াতে। যেমন আমেরিকান প্রাতরাশের টেবিলে থাকবেই থাকবে, পাঁচ থেকে সাত রকমের দুধ, কিছু না হলেও ছয় সাত প্রকারের ফল বা ফলের রস, প্রচুর সিরিয়াল ও কফি। এছাড়াও থাকতে পারে প্যানকেক, ফ্রেঞ্চ টোষ্ট, বেলজিয়ান ওয়াফেল, মাফিন, বিভিন্ন মিষ্টি কেক জাতীয় রুটি, ইত্যাদি। আর মাখন থাকলেও তার সাথেই থাকবে রকমারি চিজ, মারমালেড অথবা মারজারিন। অর্লান্ডো হয়ে ফ্লোরিডা পাল্ম কোস্ট পৌঁছে যাওয়ার পর আমাকে রাখা হয়েছিল বেস্ট ওয়েস্টার্ন নামক একটি বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট হোটেলে। একটি ঘরে রাতের বেলা ঘুমোতে দেবে আর সকাল সকাল বিনেপয়সাতেই দেবে এই সমস্ত যাবতীয় আমেরিকান প্রাতরাশ।

পাল্ম কোস্ট ফ্লোরিডায়ে আমার প্রথম মার্কিনী মক্কেল ছিলেন রোন্যাল্ড ওয়াকার। ছোট করে রন। গিন ডেভেলপমেন্ট নামক একটি রিয়াল এস্টেট কোম্পানীর চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার। চরিত্রগত দিক দিয়ে রন ছিলেন বেশ রসিক ও বুদ্ধিমান মানুষ। মাঝে মাঝেই বেশ সরস ও চিত্তাকর্ষক আচমকা কথাবার্তা বলে শুধু আমাকে কেন, অফিসের বাকি সকলকেও হাসিয়ে ছাড়তেন রন। অলক্ষিতভাবে দেখলে কেউ প্রথমে বুঝবেইনা যে প্রায় বছর পঞ্চান্ন'র মতন বয়েস হয়েছে ওঁর তখন। আর সময় পেলেই, আমাকে জ্ঞান দিয়ে দিতেন খানিকটি। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে নিয়ে টুকরো কিছু সমালোচনা, মনিকা লিউনিস্কি'র সম্বন্ধে দুএকটি শ্লেষাত্মক রগুড়ে মন্তব্য বা ডেমক্র্যাট প্রার্থী অ্যাল গোর, বা রিপাবলিকান প্রার্থী জর্জ ডব্লুউ বুশ'কে নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনাও করেছি রনের সাথে। প্রথম দিকে দুতিনদিন দুপুরের খাবার টেবিলে আমার সাথে কিঞ্চিত গপ্পগুজব করে, রনও বোধকরি একটু কৌতূহলীই হয়ে পরছিলেন। আমাদের মার্কিন কোম্পানী'টি, গিন ডেভেলপমেন্টের হিসেবপরীক্ষা করাতে সুদুর ভারতবর্ষ থেকে একটি লোককে কেন ধার করে আনতে গেল, এই নিয়ে তাঁর বিস্ময়ের শেষ ছিলনা। কথাবার্তায়ে জানতে পেরেছিলাম, রন নাকি আমার আগে কোনও ভারতীয়র সাথে ভালো করে কথাই বলে দেখেননি। কিছুই তেমন জানেননা আমার দেশ সম্বন্ধে। আর যেটুকু জানেন সবই প্রায় ভিত্তিহীন। শুধু রন কেন, একশোর মধ্যে ষাট শতাংশ আমেরিকানই ওই সময়ে আমাদের দেশ নিয়ে কিছুই তেমন না জেনে অমূলক কিছু ধারণা করে নিতেন। তখনকার দিনে, গড়পড়তা একজন আমেরিকানের ভারতবর্ষ নিয়ে ধারণা বলতে ছিল, ভারত একটি অত্যন্ত দরিদ্র দেশ, বিদ্যুৎব্যাবস্থা

প্রায় নেই বললেই চলে, রাস্তাঘাটে হাতী ও গরুর গাড়ী ঘুরে বেড়ায় যখন তখন। ও অনেক আমেরিকানরাই মনে করতেন, ভারত একটি পুরোপুরি হিন্দু রাষ্ট্র, পঞ্চাশ শতাংশ ভারতীয়ই যোগী বা ঋষি গোছের ও প্রায় সকল ভারতীয়ই সামান্য হলেও তুকতাক ও জাদুটোনা জানেন। আর আমার মতন একটি খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকের সামনে এই সকল আহাম্মকমার্কা কথা কেউ বললে মাথা ঠিক রাখা সম্ভব হতনা। দু একবার রবিঠাকুর নিয়ে রন'কে জ্ঞান দিতে গিয়ে দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথ ও রবিশঙ্করে গুলিয়ে ফেলছেন বারেবারেই। তবুও একরকমের জেদই চেপে গিয়েছিল বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের কাছে রবিশঙ্করের চেয়েও বেশী সীমাহীন, সেটুকু রন কে বোঝাতে না পেরে সাময়িক আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল আমেরিকানদের উপর আর বাকি আমেরিকান দেখলেই কেমন যেন গাত্রদাহ হত আমার। তবে রন ছিলেন খুব ভদ্রলোক ও এই অধমের উপরে রনের কোম্পানীর ১৯৯৯ এর ডিসেম্বরের ব্যালান্স শিট নির্ভর করেছিল বলে রন আমাকে ভালো রকম সময়ও দিতেন।

আমাকে ও বছর চল্লিশেকের এক বান্ধবীকে নিয়ে ব্রাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন রন, পরের রোববারে। রোববার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ, রন ও তাঁর বান্ধবীটি আমাকে বেস্ট ওয়েস্টার্ন থেকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র তিন চার মাইল দুরেই 'ইউরোপিয়ান ভিলেজ' নামে একটি অসাধারন সুন্দর স্থানে। একই সাথে এতোগুলি রেস্তরাঁ, এতরকম কেনাকাটার জায়গা, আরাম করার লাউঞ্জগুলি দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। আর রনের সঙ্গে সঙ্গেই, রনের বান্ধবীটিও খুব মিশুকে ছিলেন। যতদুর মনে পড়ছে এখন, মহিলার নাম ছিল লোরি। লোরি আর রন মিলে মিলে আমাকে ইউরোপিয়ান ভিলেজের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে এসেছিল ব্রাঞ্চ খাওয়ার পালা। ব্রাঞ্চ খাওয়ার আগেই, সে রোববারটির সকালে, খুব অদ্ভুত ঠেকেছিল রনের আর লোরির আচরণ। সবকটি রেস্তরাঁতে একবার একবার ঢুকেই কিছু একটু জিজ্ঞাসা করেই বেড়িয়ে আসছিলেন ওঁরা। আর আমিও অজ্ঞের মতন ওঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলেছি। (ততক্ষণে বুদ্ধি খাটিয়ে ব্রাঞ্চ কথার অর্থ আমি ধরে ফেলেছি)। তারপরে বুঝলাম – ও হরি! লোরি আর রন আমারই জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিষ্পাপ নিরামিষ রেস্তরাঁ। রন ও লোরির দৃঢ় ধারণা ছিল ভারতীয় হিন্দু মানেই নাকি নিকষ নিরামিষাশী। আমি মাছ মাংস খাই জেনে, ওঁরা তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। অতঃপর আমরা ঢুকে গিয়েছিলাম আমাদের সামনেই একটি ইতালিয়ান রেস্তরাঁতে। নামটি ছিল একটু ফরাসি মার্কা - ল্য পিজেরিয়া বা ওই ধরণেরই কিছু একটি নাম।

পাল্ম কোস্টের সে রোববারের আগের চার পাঁচ দিন বেস্ট ওয়েস্টার্নের প্রাতরাশ ছাড়া কেটেছিল কেবলমাত্র সাবওয়ে বা বার্গার কিং দোকানের স্যান্ডউইচ খেয়ে। সাবওয়ে দোকানের স্যান্ডউইচকে বলা হয় সাব। সাবমেরিনের মতন দেখতে বলেই ওই নাম। বার্গার কথাটি কিন্তু এসেছে হ্যামবার্গারের ডাকনাম হিসেবে। আমেরিকানদের কাছে হ্যামবার্গার মানেই যে খাঁটি গোমাংসের স্যান্ডউইচ একথা অনেকেই কিন্তু জানেননা। আমাদের দেশে মতন ম্যাকডোনালডসের চিকেন বার্গার, নিরামিষ ভেজ বার্গার, আলু টিক্কি বার্গার ও দেশে শুনলে বুঝি সকলে হেসেই খুন হয়ে যাবেন। হ্যামবার্গারে হ্যাম থাকেনা মোটেও। থাকবে কেবল খাঁটি গোমাংস ও প্রচুর পরিমাণে চিজ। আদতে, হ্যামবার্গার কথাটি এসেছে জার্মানি দেশের শহর হামবুর্গ থেকে। শুয়োরের মাংসের যে হ্যামের কথা আমরা জানি তার সাথে এই হ্যামবার্গার নামক আমেরিকান খাদ্যটির কোনও অনুসৃতিই আসেনা। বার্গার কিং দোকানে গিয়ে বিকে চিকেন স্যান্ডউইচ বললে বা বিকে বিগ ফিশ বললেই চলবে। নামে ইতালিয়ান বা ফরাসি হলেও ইউরোপিয়ান ভিলেজের ল্য পিজেরিয়া ছিল একটি মাল্টিকুইসিন রেস্তরাঁ। পরপর চার দিন রাতে বিকে বিগ ফিশ ও বিএমটি সাব খেয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পরেছিলাম ল্য পিজেরিয়ার এশীয় কাউন্টারে। খাঁটি বাঙালী কিছু না পেলেও ওই প্রথম আমার খাঁটি চীনে খাবারের সাথে পরিচয়। আর রন ও লোরি সাথে, সে রোববার ওই এশিয়ান ব্রাঞ্চ বেশ সুখকরই লেগেছিল বলে মনে পড়ছে।

এইতো কিছুদিন আগেই তো আশির দশকের গল্প শুনিয়েছি। রাজীব গান্ধী সেই আমলেই কেমন করে এক বিদেশি কোম্পানী থেকে স্যাম পিত্রদা'কে ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন গৃহজাত ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগব্যবস্থায়ে নতুন প্রথা ও পরিবর্তন আনতে, সেই গল্প তো বলা হয়ে গিয়েছে আগেই। দিন বদলে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। বাঙালীর তখন ঘরেঘরে টেলিফোনো এসে গিয়েছিল তড়িঘড়ি আর আমার বাবা মা'ও সকাল সন্ধ্যে ফোন করেই গপ্প করতেন ওই বাচ্চুমামু-টামু দের সাথে। ২০০০ সালেই আমি মার্কিন দেশে পাড়ি দিতেই আমাদের প্রথম লাল রঙের ৭৪-৯৪১৬ নম্বরের টেলিফোনটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইন্টারনেট। ফ্লোরিডার সে দিনগুলি স্মৃতিতে আসতেই, খুব মনে পড়ছে আমার মা ও স্ত্রী'কে ইন্টারনেট ব্যাবহার করার বিষয়ে সবচেয়ে অধিক সহায়তা করেছিলেন আমার তৎকালীন কলকাতা অফিসের সহকর্মী অনমিত্র মুখোপাধ্যায় ও পিতৃবন্ধু নৃপেন কাকা। ১৯৯৫ এ সেলফোন প্রযুক্তি এসে গেলেও আমাদের সে সুবিধা ছিলনা তখনও। আমার বাড়ীর কম্পিউটার থেকে অনমিত্র কি যেন একটি অদ্ভুত বেআইনি পদ্ধতিতে আমার মা'কে একটি মাইক্রোফোন ও হেডফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট চালিয়ে আমার কম্পিউটারে ডায়াল করতে শিখিয়ে দিয়েছিল। সাড়ে নয় ঘন্টা'র হিসেব মা অতকিছু করতেননা। মাঝে মধ্যেই ইন্টারনেট চালিয়ে বসে যেতেন আমাকে ডায়াল করতে। গিন ডেভেলপমেন্টের অফিস থেকে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ফিরেই বসে যেতাম ওই ইন্টারনেট টেলিফোনির হার না মানা খেলায়ে। বেস্ট ওয়েস্টার্নের খাটে শুয়ে শুয়ে যে কত মা আর বউয়ের সাথে গল্প করেছি, তার ইয়ত্তা নেই কোনও।

তারপরের একদুই সপ্তাহের মধ্যে নকলনবীশী করে, আমি তখন পাক্কা মার্কিনী। কথায়ে কথায়ে, হেই... হাও আর ইয়উ ডুইং / হাও ইস ইট গোয়িং / সাউন্ডস গুড / টেক কেয়ার / ওয়াটস আপ ইত্যাদি ঝাড়ছি। যখন তখন আমার ম্যানেজার বাবু অ্যাডাম কিগলিকে ভয়েস মেল করে জানিয়ে দিচ্ছি গিন ডেভেলপমেন্টের যাবতীয় সাম্প্রতিকতম তথ্য। কখনও সুন্দরী জ্যানেটেকে একটি ছোট্ট করে ফোন করে 'হাই' বলে দেওয়া। তাছাড়া তখন আমার অনেক চেনা পরিচিত। অ্যান্ডি, ম্যান্ডি, গাস, নিক... আর তার সাথে রন ও লোরি তো আছেনই। তবুও যে কিসের একটি বিমর্ষতা কাজ করত কে জানে। বেস্ট ওয়েস্টার্নের ঘরে ফিরে এলেই কেন জানিনা ভীষণ স্ফূর্তি-শূন্যতায়ে ভুগতাম। বড় একা লাগত। ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দু-একবার মায়ের কথা ও জীবনসঙ্গিনীটির কথা মনে করে একটু সামান্য চোখের জলও বেরিয়েছে বলেই মনে পড়ছে।

রোববার ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০০। সকাল বেলা একাই বেরিয়েছিলাম। চল্লিশ মিনিট দুরত্বেই আমার অনেককালের স্বপ্নের 'ডেটোনা বিচ'। গলায়ে ঝোলান সদ্য কেনা একটি আসাহি পেন্ট্যাক্স ক্যামেরা। বিচের থেকেও ইচ্ছে ছিল দেখে নেবো ডেটোনা ইন্টারন্যাশনাল স্পীডওয়ে। স্পীডওয়ে দেখেছিলাম খুব মনে পড়ছে, তার সাথে উপরি পাওনা হয়েছিল একটি অসাধারণ মেরিন মিউজিয়াম দেখে। অনবদ্য একটি গলফ কোর্সের মধ্যে অপরিচিত একটি রেস্তরাঁয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে একটু অ্যাটলান্টিকের ছবি তুলেই বেস্ট ওয়েস্টার্নের ঘরে ফিরতে ফিরতে বেশ সন্ধ্যেই হয়ে গিয়েছিল মনে পড়ছে। রাত নটা নাগাদ অভ্যাসবশেই কম্পিউটার চালিয়ে কলকাতায়ে ফোন সেরেই আমি ঘুমিয়েই পরেছিলাম সারাদিনের ক্লান্তিতে।

পাল্ম কোস্ট ফ্লোরিডায়ে তখন ঘড়িতে বাজে রাত দুটো। বেস্ট ওয়েস্টার্নের ঘরে বিছানায়ে রাখা ল্যাপটপ কম্পিউটার'টি বেজে উঠেছিল বারবার। ফের ফোন করেছেন মা। ভুলে মেরে দিয়েছেন ছেলের তখন বাজছে রাত দুটো। আমার শুধু এখন এটুকুই মনে আছে, মা প্রকাণ্ড চিৎকার করে উঠেছিলেন। উল্লাসের চিৎকার। প্রথমে বুঝিনি কিছুই, একে তো ঘুমের ঘোর, তারপরে মায়ের অমন গলাবাজি। দুএকটি কথার পরেই বুঝে গেলাম, আমার বাবা ল্যাবরেটরি থেকে রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন। সংবাদ আর কিছুই নয়। আমার ইটরঙের শাড়ি পড়া দয়িতা'টি মা হতে চলেছেন।

দুমিনিট পরে ফোন কেটে দিয়ে বেস্ট ওয়েস্টার্নের বিছানায়ে রাখা একটি খুব ছোট্ট কোলবালিশ জড়িয়ে চাপা গলায়ে বলে উঠলাম, "থ্রী চিয়ারস ফর ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড... হিপ হিপ হুররে..."।

ক্রমশ...